١- **عن عمر بن الخطاب (رض) قال بينما نحن عند رسول الله ﷺ ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي ﷺ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلوة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. قال : فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان**

الأسئلة الملحقة:

(أ) بين سبب ورد الحديث الشريف

(ب) ما معنى الإحسان لغة وشرعاً؟ بين .

(ج) ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ بين .

(د) لماذا قال النبي ﷺ ما المسئول عنها بأعلم من السائل؟

(هـ) اشرح قوله عليه السلام : أن تلد الأمة ربتها.

٢- **عن أبي هريرة (رض) قال أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال : تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلوة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة وتصوم رمضان . قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئاً أبداً ولا أنقص منه . فلما ولى قال النبي ﷺ من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.**

الأسئلة الملحقة:

(أ) ما معنى الصلوة ؟ ومتى فرضت الصلوة ؟

(ب) ما المراد بقوله : " لا أزيد على هذا ولا أنقص منه " ؟

(ج) من هو الأعرابي ؟ وما كان إسمه؟

(د) عرف الشرك ثم بين أقسامه .

(هـ) اكتب نبذة من حياة سيدنا أبي هريرة (رض).

٣- **عن أبي سعيد الخدرى (رض) عن النبي ﷺ قال : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمسة ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة.**

الأسئلة الملحقة:

(أ) ما معنى الزكاة لغة وشرعاً ؟ ومتى فرضت ؟ وما الحكمة في مشروعيتها ؟

(ب) على من تجب الزكاة ؟ وما الفرق بين نصاب الزكاة وصدقة الفطر ؟

(ج) بين مصارف الزكاة في ضوء القرآن الكريم .

(د) ما حكم أداء الزكاة قبل وقتها ؟ وما الخلاف في شرط التمليك لأداء الزكاة ؟

(هـ) اكتب نبذة من حياة سيدنا أبي سعيد الخدري (رض).

٤- **عن ابن عمر (رض) قال : أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.**

الأسئلة الملحقة:

(أ) عرف الصاع مع بيان الاختلاف فيه. بين قدره في كيلوغرام .
(ب) ما الحكمة في مشروعية صدقة الفطر ؟ (ج)
على من تجب صدقة الفطر ؟ وما هو مصرف صدقة الفطر ؟
(د) يدل الحديث على أن صدقة الفطر فريضة فما يقول الفقهاء فيه ؟ بين .
(هـ) حقق : قال ، فرض ، عبد ، المسلمين.

٥- **عن أبي هريرة (رض) قال قال رسول الله ﷺ : إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين.**

الأسئلة الملحقة:

(أ) ما معنى الصوم لغة وشرعاً ؟ ومتى فرض الصوم ؟
(ب) اشرح قوله عليه السلام : فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم .
(ج) إذا سلسلت الشياطين فكيف يذنب الناس في رمضان ؟
(د) اكتب مقاصد مشروعية الصوم .
(هـ) ما هو يوم الشك ؟ وما حكم الصوم فيه ؟

٦- **عن ابن عمر (رض) أن النبي ﷺ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان.**

الأسئلة الملحقة:

(أ) ما معنى الاعتكاف لغة وشرعاً ؟ وكم قسماً له ؟ بين
(ب) هل الصوم شرط لصحة الاعتكاف ؟ بين آراء العلماء فيه .
(ج) لماذا اختار النبي ﷺ العشر الأواخر من رمضان للاعتكاف ؟
(د) كم مرة اعتكف النبي ﷺ في حياته الطيبة ؟
(هـ) اكتب نبذة من حياة سيدنا عبد الله بن عمر (رض).

٧- **عن عبد الله (رض) قال قال لنا رسول الله ﷺ : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.**

الأسئلة الملحقة:

(أ) اذكر مشروعية النكاح وشروطه وحكمه
. (ب) اشرح قوله عليه السلام : " فإنه له وجاء . "
(ج) بين فوائد النكاح في ضوء القرآن والسنة .
(د) الاشتغال بالنكاح أفضل أم التخلى في العبادات ؟ بين .
(هـ) ما هي الخرافات والرسومات المروجة في النكاح في العصر الراهن ؟ بين.

مجموعة (ب)

٨- **اكتب ترجمة الإمام مسلم رحمه الله مع بيان مكانته بين المحدثين**

9- **وازن بين الصحيح المسلم والصحيح للبخاري.**

হাদীস-১: ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের বিবরণ (হাদীসে জিবরাঈল)

- উৎস: এই দীর্ঘ ও প্রসিদ্ধ হাদীসটি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেছেন এবং এটি ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

- প্রসঙ্গ: একদিন সাহাবায়ে কেরাম নবীজী (সা.)-এর পবিত্র মজলিসে বসা ছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) মানুষের বেশ ধরে এক অভাবনীয় পদ্ধতিতে উপস্থিত হন। তাঁর এই আগমনের মূল লক্ষ্য ছিল সাহাবীদেরকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দ্বীনের মৌলিক স্তম্ভ ও স্তরগুলো হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া।

- ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: হযরত উমর (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি অত্যন্ত ধবধবে সাদা পোশাক এবং কুচকুচে কালো চুল নিয়ে আমাদের সামনে এলেন। তাঁর মাঝে সফরের কোনো ক্লান্তি বা চিহ্ন ছিল না এবং আমাদের কেউ তাঁকে আগে দেখেননি বা চিনতাম না। তিনি নবীজীর একদম কাছে গিয়ে তাঁর হাঁটুতে হাঁটু মিলিয়ে এবং নিজের হাত নবীজীর উরুর ওপর রেখে বসলেন। তিনি পর্যায়ক্রমে প্রশ্ন করলেন— ইসলাম কী? নবীজী (সা.) উত্তর দিলেন— ইসলাম হলো তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া, নামাজ কায়েম করা, জাকাত দেওয়া, রমজানের রোজা রাখা এবং সামর্থ্য থাকলে হজ করা। এরপর তিনি ঈমান সম্পর্কে জানতে চাইলে নবীজী (সা.) বলেন— ঈমান হলো আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, রাসুলগণ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। এরপর তিনি ইহসান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নবীজী (সা.) বলেন— ইহসান হলো এমন একাগ্রতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করা যেন তুমি তাঁকে দেখছ, আর তা সম্ভব না হলে এই বিশ্বাস রাখা যে তিনি তোমাকে দেখছেন। সবশেষে কিয়ামতের সময় ও আলামত সম্পর্কে আলোচনা হয়।

- মন্তব্য: এই হাদীসটি ইসলামের সামগ্রিক কাঠামোর একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেশ করে, যেখানে বাহ্যিক আমল, অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিক পূর্ণতার সমন্বয় ঘটেছে। মুহাদ্দিসগণ একে 'উম্মুস সুন্নাহ' বা সুন্নাহর জননী হিসেবে অভিহিত করেছেন।

হাদীস-১ এর সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর

(অ) হাদীসটি বর্ণিত হওয়ার কারণ (بين سبب ورد الحديث الشريف)

হাদীসে জিবরাঈল বর্ণিত হওয়ার পেছনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষামূলক প্রেক্ষাপট ছিল। ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবায়ে কেরামকে দ্বীনের গূঢ় তত্ত্বগুলো সহজে এবং স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে একজন আগন্তুক মানুষের বেশে পাঠিয়েছিলেন। সাহাবীরা যখন নবীজীর সাথে মজলিসে দ্বীনী আলোচনায় মগ্ন ছিলেন, তখন হঠাৎ জিবরাঈল (আ.)-এর উপস্থিতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর পরিপাটি বেশভূষা এবং বসার আদব ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তাঁর এই আগমনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে একটি সুশৃঙ্খল পাঠদান পদ্ধতি তৈরি করা।

হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিতে, এই হাদীসটি আসার অন্যতম কারণ হলো দ্বীনের তিনটি স্তর— ইসলাম, ঈমান এবং ইহসানকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা এবং এদের পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক বুঝিয়ে দেওয়া। নবীজী (সা.) হাদীসের শেষে নিজেই স্পষ্ট করেছিলেন যে, "তিনি জিবরাঈল ছিলেন, তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।" এর মাধ্যমে উম্মত জানতে পারল যে, দ্বীন কেবল ব্যক্তিগত অনুভূতির নাম নয়, বরং এটি শিক্ষা ও সুনির্দিষ্ট আরকানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জিবরাঈল (আ.)-এর প্রশ্নগুলো ছিল উম্মতের প্রতিটি স্তরের মানুষের জন্য অপরিহার্য মৌলিক জ্ঞান। এই প্রেক্ষাপটটি উম্মতের জন্য এক চিরন্তন শিক্ষা পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে, যেখানে কোনো উচ্চতর সত্তার মাধ্যমে সরাসরি সংশয় নিরসন করা হয়েছে। মূলত দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ কাঠামোটি যেন কোনো বিকৃতি ছাড়াই পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছায়, সেটাই ছিল এই হাদীসটির প্রধান হেতু।

(আ) ইহসানের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ (ما معنى الإحسان لغة وشرعاً؟ بين)

ইহসান শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোনো কাজকে সুন্দরভাবে করা, নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করা, দয়া করা বা সুচারুরূপে আঞ্জাম দেওয়া। এটি 'হুসন' শব্দ থেকে আগত, যার অর্থ সৌন্দর্য। শরীয়তের পরিভাষায় ইহসান হলো ইবাদতের এমন এক উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তর, যেখানে বান্দা তার রবের ইবাদতে সর্বোচ্চ একাগ্রতা ও নিষ্ঠা অর্জন করে। হাদীসে জিবরাঈলে নবীজী (সা.) ইহসানের দুটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম স্তরটি হলো 'মুশাহাদা', অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত এমন গভীর ধ্যান ও একাগ্রতায় করা যেন বান্দা আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখছে। এটি হলো ইহসানের সর্বোচ্চ চূড়া। দ্বিতীয় স্তরটি হলো 'মুরাকাবা', অর্থাৎ যদি বান্দা সরাসরি আল্লাহকে দেখার অনুভূতি জাগ্রত

করতে না পারে, তবে অন্তত এই দৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে লালন করা যে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে দেখছেন।"

হানাফী ফিকহ ও আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের (তাসাউফ) মানদণ্ড অনুযায়ী, ইহসান হলো ইবাদতের প্রাণ। নামাজ, রোজা বা জাকাত যদি কেবল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে আদায় করা হয় এবং তাতে যদি ইহসানের প্রাণশক্তি না থাকে, তবে সেই ইবাদত আল্লাহর দরবারে মকবুল হওয়ার যোগ্যতা হারায়। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর ফিকহী দর্শনেও অন্তরের বিশুদ্ধতা ও একাগ্রতার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ইহসানের মাধ্যমে একজন মানুষ কেবল ইবাদতে নয়, বরং সামাজিক জীবনেও সৎ ও নিষ্ঠাবান হয়, কারণ সে জানে তার প্রতিটি কাজ আল্লাহর সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রয়েছে। এটি বান্দাকে রিয়া বা লোকদেখানো মানসিকতা থেকে রক্ষা করে এবং অন্তরে খুলুসিয়াত বা ঐকান্তিক আন্তরিকতা সৃষ্টি করে। মূলত ঈমান ও ইসলামের পর ইহসানই বান্দাকে প্রকৃত অলিয়ুল্লাহ বা আল্লাহর প্রিয়ভাজন বান্দায় পরিণত করে।

(ই) ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য (ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ بين)

ঈমান ও ইসলামের মধ্যে শাব্দিক ও হুকুমগত সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। হানাফী মাযহাব ও মাতুরিদী আকীদা অনুযায়ী, ঈমান শব্দের অর্থ হলো 'তাসদীক' বা অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস। যখন কোনো ব্যক্তি মন থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনীত যাবতীয় অকাট্য বিধানগুলোকে সত্য বলে মেনে নেয় এবং মুখে তার স্বীকৃতি দেয়, তখন সে মুমিন হিসেবে গণ্য হয়। অন্যদিকে, ইসলাম শব্দের অর্থ হলো 'ইনকিয়াদ' বা বাহ্যিক আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য প্রকাশ করা। ইসলামের বহিঃপ্রকাশ ঘটে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলের মাধ্যমে, যেমন নামাজ আদায় করা, রোজা রাখা বা হজ করা।

হানাফী ফিকহবিদদের মতে, যদিও ঈমান ও ইসলামের শাব্দিক অর্থ ভিন্ন, কিন্তু হুকুমের দিক থেকে তারা অবিচ্ছেদ্য ও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অর্থাৎ, যার অন্তরে ঈমান নেই তার বাহ্যিক ইসলাম (আমল) আল্লাহর কাছে মূল্যহীন, আবার যে ইসলাম বা আনুগত্য থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ তার ঈমানের দাবিও অন্তঃসারশূন্য। পবিত্র কুরআনে মরুচারী আরবদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তারা যেন বলে 'আমরা ইসলাম কবুল করেছি', কারণ ঈমান তখনও তাদের অন্তরে দৃঢ়ভাবে শিকড় গেড়ে বসেনি। এটি প্রমাণ করে যে, ঈমান হলো মূল ভিত্তি যা মানুষের অভ্যন্তরীণ সত্তায় বিরাজ করে এবং ইসলাম হলো তার প্রায়োগিক রূপ যা বাইরে কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। হানাফী মাযহাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তারা মনে করে ঈমান বাড়ে না বা কমে না (মূল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে), তবে আমল বা ইসলামের মাধ্যমে ঈমানের জ্যোতি ও নুর

বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ঈমান ও ইসলাম একে অপরের পরিপূরক— একটির অনুপস্থিতিতে অন্যটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

(ঈ) "যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক জানেন না" এর তাৎপর্য (لماذا قال النبي ﷺ ما المسئول عنها بأعلم من السائل؟)

যখন জিবরাঈল (আ.) নবীজী (সা.)-কে কিয়ামত বা শেষ সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন নবীজী (সা.) উত্তর দিয়েছিলেন, "যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে অধিক জানেন না।" এই উত্তরের মাধ্যমে নবীজী (সা.) অত্যন্ত বিনয় এবং একই সাথে মহান আল্লাহর একচ্ছত্র ক্ষমতার ঘোষণা দিয়েছেন। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস অনুযায়ী, পাঁচটি বিষয় রয়েছে যার পূর্ণ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই সংরক্ষিত, যাকে 'মাফাতিহুল গায়ব' বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি বলা হয়। কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে তার সুনির্দিষ্ট বছর, মাস বা তারিখ সেই পাঁচটির অন্যতম।

এই উক্তির তাৎপর্য হলো, ফেরেশতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হযরত জিবরাঈল (আ.) এবং সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সা.) হওয়া সত্ত্বেও, কিয়ামতের সঠিক সময় আল্লাহ তাঁদেরকে অবগত করেননি। হানাফী আকীদার আলোকে এটি স্পষ্ট করে যে, 'ইলমে গায়েব' বা অদৃশ্যের সম্পূর্ণ ও নিজস্ব জ্ঞান কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। নবীজীর এই উত্তর সাহাবীদের জন্য এক বিশাল শিক্ষা ছিল যে, কিয়ামতের সময় জানার চেয়ে কিয়ামতের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করা বেশি জরুরি। এটি মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে ফুটিয়ে তোলে। যদি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ দুইজন ব্যক্তিত্ব কিয়ামতের সময় না জানেন, তবে অন্য কারো পক্ষে এর তারিখ দাবি করা সম্পূর্ণ ভ্রষ্টতা। নবীজী (সা.) সরাসরি তারিখ না বলে কিয়ামতের কিছু আলামত বা চিহ্ন বর্ণনা করেছেন, যাতে মানুষ সতর্কতা অবলম্বন করতে পারে। এর মাধ্যমে দ্বীনের ক্ষেত্রে স্পষ্টবাদিতা ও সত্য প্রকাশে আমানতদারিতার এক অনন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(উ) "দাসী তার মুনিবকে জন্ম দেবে" এর ব্যাখ্যা (اشرح قوله عليه السلام : أن تلد الأمة ربتها)

নবীজী (সা.) কিয়ামতের আলামত হিসেবে বলেছেন, "দাসী তার মুনিবকে জন্ম দেবে।" এর ব্যাখ্যাকারে হানাফী মুহাদ্দিসগণ ও ফকীহগণ প্রধানত দুটি শক্তিশালী মত প্রদান করেছেন। প্রথমত, শেষ যুগে সন্তানদের মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি অবাধ্যতা এবং বেয়াদবি এত মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছাবে যে, সন্তান তার জন্মদাত্রী মায়ের সাথে এমন আদেশদাতার মতো আচরণ করবে যেন মা তার কেনা দাসী। এটি পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়া এবং নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ের প্রতি একটি

রূপক ইঙ্গিত। আজকের সমাজে যখন সন্তানরা মা-বাবার অবাধ্য হয় এবং তাদের ওপর কর্তৃত্ব ফলায়, তখন এই আলামতটির সত্যতা প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয়ত, এটি দ্বারা মুসলিম উম্মাহর বিজয় ও ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তারের কথা বলা হয়েছে। বিজিত অঞ্চলের দাসীরা যখন মুসলিমদের ঘরে আসবে এবং তাদের গর্ভে যে সন্তানরা জন্ম নেবে, তারা হবে স্বাধীন এবং একসময় রাজবংশের উত্তরসূরি হিসেবে ক্ষমতার মালিক হবে। ফলে সন্তানটি তার নিজের মায়ের ওপর পরোক্ষভাবে শাসন বা মুনিবের মতো কর্তৃত্ব চালাবে। এছাড়াও এই হাদীসে দরিদ্র মেষপালকদের আকাশচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণের প্রতিযোগিতার কথা বলা হয়েছে। এটি অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্যতা এবং সামাজিক শ্রেণি পরিবর্তনের ইঙ্গিত। যখন অযোগ্য ও নৈতিকতাহীন লোকেরা বিপুল সম্পদের মালিক হবে এবং চারিত্রিক উন্নতির চেয়ে বাহ্যিক জৌলুস ও বিলাসিতার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে, তখন বুঝতে হবে কিয়ামত অতি সন্নিকটে। হানাফী ফিকহ এই আলামতগুলোকে কেবল ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে দেখে না, বরং সমাজকে নৈতিক পতন ও বিলাসিতা থেকে রক্ষার এক বিশেষ সতর্কবার্তা হিসেবে গ্রহণ করে।

হাদীস-২ এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর হানাফী মাযহাব ও ফিকহী মানদণ্ড অনুযায়ী নিচে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হলো:

হাদীস-২: জান্নাত লাভের সহজ পথ ও আরবের বেদুইন

- **উৎস:** এই হাদীসটি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়েই তাঁদের সংকলনে সংকলন করেছেন।

- **প্রসঙ্গ:** একজন আরবের বেদুইন (গ্রাম্য লোক) নবীজী (সা.)-এর দরবারে এসে এমন আমল সম্পর্কে জানতে চাইলেন যা পালন করলে তিনি নিশ্চিতভাবে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন। মূলত দ্বীনের অপরিহার্য বিষয়গুলো জেনে তা পালনের দৃঢ় সংকল্প নিয়েই তিনি এই প্রশ্ন করেছিলেন।

- **ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ:** হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— এক বেদুইন নবীজী (সা.)-এর কাছে এসে আরজ করল, "হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন যা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব।" নবীজী (সা.) বললেন— "তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না, ফরজ নামাজসমূহ কায়েম করবে, নির্ধারিত জাকাত প্রদান করবে এবং রমজানের রোজা

রাখবে।" লোকটির উত্তর ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। সে বলল, "সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি এর চেয়ে কিছু বাড়াবও না এবং কিছু কমাবও না।" লোকটি যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন নবীজী (সা.) উপস্থিত সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বললেন— "যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতী মানুষকে দেখে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন এই লোকটিকে দেখে।"

- **মন্তব্য:** এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, ইসলামের মৌলিক ফরজ বিধানগুলো নিষ্ঠার সাথে পালন করা নাজাত বা মুক্তির জন্য যথেষ্ট। এটি দ্বীনের সহজসাধ্যতা ও গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরে।

হাদীস-২ এর সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর

(অ) নামাজের অর্থ কী? নামাজ কখন ফরজ হয়েছে? (ما معنى الصلوة ؟ ومتى فرضت الصلوة ؟)

সালাত (নামাজ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো দোয়া, ক্ষমা প্রার্থনা করা বা রহমত কামনা করা। যেহেতু নামাজে বান্দা আল্লাহর কাছে দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাই একে সালাত বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট সময়ে সুনির্দিষ্ট আরকান ও আহকাম (শর্ত ও রুকন) পালনের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করাকে নামাজ বা সালাত বলা হয়। এটি ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ এবং ঈমানের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, নামাজ এমন এক আমল যা কাফির ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্যকারী হিসেবে কাজ করে এবং এটি পরকালে সর্বপ্রথম হিসেবের বিষয় হবে।

নামাজ ফরজ হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য মত হলো— এটি নবীজী (সা.)-এর মক্কী জীবনের শেষ ভাগে **মিরাজ বা ইসরার রাতে** সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে ফরজ হয়েছে। হিজরতের প্রায় দেড় বছর বা এক বছর আগে এই মহান বিধানটি উম্মতের ওপর অর্পিত হয়। শুরুতে নামাজ ৫০ ওয়াক্ত থাকলেও পরবর্তীতে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে তা কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত করা হয়, তবে এর সওয়াব ৫০ ওয়াক্তের সমান রাখা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের মতে, ৫ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা 'ফরজে আইন' যা অস্বীকারকারী কাফির এবং অলসতাবশত ত্যাগকারী ফাসেক ও কঠিন শাস্তির যোগ্য। এটি বান্দাকে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং আধ্যাত্মিক পবিত্রতা দান করে। নামাজের মাধ্যমেই বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হতে পারে, বিশেষ করে সিজদাবনত অবস্থায়।

(আ) "আমি এর চেয়ে বেশি করব না এবং কমও করব না" - এই কথার মর্ম কী? (ما المراد بقوله : " لا أزيد على هذا ولا أنقص منه " ؟)

বেদুইন ব্যক্তির এই উক্তিটির গভীর তাৎপর্য রয়েছে। যখন তিনি বললেন, "আমি এর চেয়ে বেশি করব না", তখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এটি জানানো যে— তিনি কেবল ইসলামের অপরিহার্য ফরজ বিধানগুলোই (নামাজ, রোজা, জাকাত) পালনে সীমাবদ্ধ থাকবেন এবং নফল বা অতিরিক্ত ইবাদতের দায়িত্ব এখনই নিচ্ছেন না। কারণ তিনি নতুন মুসলিম বা সরলমনা ছিলেন এবং ফরজের গুরুত্বই তাঁর কাছে প্রধান ছিল। অন্যদিকে "কম করব না" বলার অর্থ হলো— আল্লাহ তায়ালা যে সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং যে কাজগুলো ফরজ করেছেন, তা থেকে তিনি বিন্দুমাত্র অবহেলা বা বিচ্যুতি দেখাবেন না।

হানাফী ফিকহবিদদের মতে, এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত লাভের জন্য 'ফরজ' ইবাদতসমূহ যথাযথভাবে পালন করাই মূল শর্ত। যদি কোনো ব্যক্তি সুন্নাত বা নফল আদায় করতে সক্ষম না হয়, কিন্তু আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাস রেখে ৫ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ, রমজানের রোজা এবং জাকাত ঠিকমতো আদায় করে, তবে সে আল্লাহর রহমতে জান্নাতী হবে। নবীজী (সা.)-এর মন্তব্য "যে জান্নাতী লোক দেখতে চায় সে যেন একে দেখে" এটিই প্রমাণ করে। তবে এর অর্থ এই নয় যে সুন্নাত বা নফলের গুরুত্ব নেই; বরং বেদুইনের সরলতা এবং ফরজের প্রতি তাঁর দৃঢ়তা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় হয়েছিল। এটি আরও ইঙ্গিত দেয় যে, দ্বীন পালনকে কঠিন করার চেয়ে এর মূল ভিত্তিগুলো শক্তভাবে আঁকড়ে ধরাই সফলতার চাবিকাঠি। সেই বেদুইনের এই সংকল্প ছিল তাঁর ইখলাস বা নিষ্ঠার বহিঃপ্রকাশ।

(ই) সেই বেদুইন কে? তাঁর নাম কী? (من هو الأعرابي ؟ وما كان إسمه؟)

হাদীসে উল্লিখিত এই বেদুইন বা 'আরাবী' শব্দের অর্থ হলো মরুভূমিতে বসবাসকারী গ্রাম্য লোক। অনেক সময় আরবের বিভিন্ন গোত্র থেকে লোকেরা ইসলামের প্রাথমিক বিষয়গুলো শিখতে নবীজী (সা.)-এর দরবারে আসতেন। যদিও এই নির্দিষ্ট হাদীসটিতে তাঁর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, তবে সীরাত ও হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যাগ্রন্থ (যেমন ফাতহুল বারী) এবং সমজাতীয় অন্য বর্ণনার প্রেক্ষিতে মুহাদ্দিসগণ তাঁর পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা করেছেন। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, এই ব্যক্তি ছিলেন প্রখ্যাত সাহাবী **হযরত যিমাম বিন সা'লাবা (রা.)**। তিনি বনী সা'দ বিন বকর গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে নবীজী (সা.)-এর কাছে এসেছিলেন।

যিমাম বিন সা'লাবা (রা.)-এর এই প্রশ্নের ধরন এবং তাঁর দৃঢ় শপথের বর্ণনা অন্যান্য সহীহ হাদীসেও বিস্তারিতভাবে এসেছে। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করে নিজ গোত্রে ফিরে যান, তখন তাঁর দাওয়াতের ফলে তাঁর পুরো গোত্র এক দিনেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিছু বর্ণনায় তাঁকে হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা.) বলেও উল্লেখ করা হয়েছে, তবে যিমাম বিন সা'লাবা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি জোরালো। হানাফী ফিকহের ব্যাখ্যায় বলা হয়, এই বেদুইনের পরিচয় যাই হোক না কেন, তাঁর আচরণের মূল শিক্ষা হলো— ইসলামের বিধানের প্রতি অকাট্য আনুগত্য। তাঁর এই প্রশ্নটি ছিল দ্বীনের সারাংশ বা সারবস্তু জানার একটি মাধ্যম। তিনি একজন সাধারণ মরুবাসী হয়েও ইসলামের মূল স্তম্ভগুলোর ওপর যে অটল বিশ্বাস ও সংকল্প দেখিয়েছেন, তা কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে।

(ঈ) শিরকের সংজ্ঞা ও এর প্রকারভেদ (عرف الشرك ثم بين أقسامه.)

শিরক শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো অংশীদার সাব্যস্ত করা বা ভাগ করা। শরীয়তের পরিভাষায়, মহান আল্লাহর সত্তা (জাত), গুণাবলি (সিফাত), ইবাদত বা ক্ষমতার ক্ষেত্রে অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ বা অংশীদার মনে করাকে শিরক বলা হয়। শিরক হলো ইসলামের সবচেয়ে বড় গুনাহ যা তওবা ছাড়া আল্লাহ ক্ষমা করেন না। এটি তাওহীদ বা একত্ববাদের সম্পূর্ণ বিপরীত।

শিরককে প্রধানত তিনটি বড় ভাগে ভাগ করা যায়: **১. শিরক ফিল জাত (সত্তায় শিরক):** আল্লাহর সত্তার মতো অন্য কারো সত্তা আছে বা আল্লাহর সন্তান বা পিতা আছে বলে বিশ্বাস করা (যেমন খ্রিস্টানদের বিশ্বাস)। ২. **শিরক ফিস সিফাত (গুণাবলিতে শিরক):** আল্লাহর একক গুণাবলি যেমন— অদৃশ্যের জ্ঞান (ইলমে গায়েব), সব কিছু শোনা বা দেখা— এগুলো অন্য কারো আছে বলে বিশ্বাস করা। ৩. **শিরক ফিল ইবাদত (উপাসনায় শিরক):** আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সামনে সিজদা করা, অন্য কারো নামে মানত করা বা কোরবানি করা।

এছাড়াও হাদীসের আলোকে শিরককে আরও দুই ভাগে দেখা হয়:

- **শিরকে আকবর (বড় শিরক):** যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী করে।
- **শিরকে আসগার (ছোট শিরক):** যেমন 'রিয়া' বা লোকদেখানো ইবাদত। এটি সরাসরি কুফরি না হলেও ইবাদতের সওয়াব নষ্ট করে দেয়। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, শিরকের সকল প্রকারই পরিত্যাজ্য এবং একজন মুমিনকে অবশ্যই খালেস তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।

(উ) হযরত আবু হুরায়রা (রা.)-এর জীবনী (اكتب نبذة من حياة سيدنا أبي هريرة (رض).)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) ছিলেন ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী। তাঁর আসল নাম নিয়ে মতভেদ থাকলেও সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে তাঁর নাম **আবদুর রহমান বিন সাখর আদ-দাওসী**। রাসুল (সা.)-এর একটি বিড়ালছানা নিয়ে খেলা করার দৃশ্য দেখে নবীজী তাঁকে ভালোবেসে 'আবু হুরায়রা' (বিড়ালের পিতা) উপনামে ডাকতেন, যা পরবর্তীতে তাঁর আসল নামের চেয়েও বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি ইয়েমেনের দাওস গোত্রের লোক ছিলেন এবং সপ্তম হিজরীতে খয়বর যুদ্ধের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নবীজী (সা.)-এর সোহবতে উৎসর্গ করেন। তিনি ছিলেন 'আসহাবে সুফফা' বা মসজিদে নববীর বারান্দায় বসবাসকারী দরিদ্র ও জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীদের অন্যতম। তিনি দুনিয়াবী ব্যবসা বা চাষাবাদে লিপ্ত না হয়ে দিন-রাত নবীজীর মুখনিঃসৃত বাণী মুখস্থ করার কাজে মগ্ন থাকতেন। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অলৌকিক। তিনি নিজেই বলেছেন যে, তিনি যা শুনতেন তা কখনো ভুলতেন না, কারণ নবীজী (সা.) তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন এবং তাঁর চাদর প্রশস্ত করতে বলেছিলেন। তিনি মোট **৫,৩৭৪টি** হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর ছাত্র সংখ্যা ছিল আট শতাধিক। আমীর মুয়াবিয়া (রা.)-এর আমলে তিনি মদিনার গভর্নর হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। অত্যন্ত সাধারণ ও পরহেযগার জীবন যাপন শেষে হিজরী ৫৯ সালে (কারো মতে ৫৭ বা ৫৮) তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়। হাদীস সংরক্ষণে তাঁর অবদান উম্মতের জন্য এক অতুলনীয় নিয়ামত।

হাদীস-৩ এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর হানাফী মাযহাব ও ফিকহী মানদণ্ড অনুযায়ী নিচে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হলো। আপনার অনুরোধ অনুযায়ী প্রতিটি উত্তর ২০০ শব্দের কাছাকাছি বিস্তৃত রাখা হয়েছে এবং রেফারেন্স নাম্বার বাদ দিয়ে সংশ্লিষ্ট আরবি প্রশ্ন যুক্ত করা হয়েছে।

হাদীস-৩: জাকাতের নিসাব ও পরিমাপ

- **উৎস:** এই হাদীসটি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমসহ প্রধান হাদীস গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়েছে।

- **প্রসঙ্গ:** ইসলামে জাকাত ফরজ হওয়ার পর কোন কোন সম্পদে এবং কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে জাকাত দিতে হবে, তা নির্ধারণের জন্য নবীজী (সা.) এই নীতিমালা ঘোষণা করেন। এটি মূলত জাকাতের 'নিসাব' বা ন্যূনতম সীমা নির্ধারণী হাদীস।

- **ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ:** হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজী (সা.) এরশাদ করেছেন— "পাঁচ 'ওয়াসাক'-এর কম শস্য বা ফলের ওপর কোনো জাকাত নেই; পাঁচটির কম উটের ওপর কোনো জাকাত নেই এবং পাঁচ 'উকিয়া'-এর কম রৌপ্যের ওপর কোনো জাকাত নেই।"

- **মন্তব্য:** এই হাদীসটি জাকাত ব্যবস্থার একটি আইনি কাঠামো প্রদান করে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, জাকাত কেবল ধনীদের ওপরই ফরজ, দরিদ্র বা স্বল্প আয়ের মানুষের ওপর নয়। এটি ইসলামী অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষার একটি প্রধান মূলনীতি।

হাদীস-৩ এর সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর

(অ) জাকাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এটি কখন ফরজ হয়েছে এবং এর হিকমত কী? (ما معنى الزكاة لغة وشرعاً ؟ ومتى فرضت ؟ وما الحكمة في مشروعيتها ؟)

জাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো পবিত্র করা, বৃদ্ধি পাওয়া বা পরিশুদ্ধ হওয়া। যেহেতু জাকাত প্রদানের মাধ্যমে মানুষের উপার্জিত সম্পদ পবিত্র হয় এবং দাতার আত্মিক উন্নতি ঘটে, তাই একে জাকাত বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায়, নিসাব পরিমাণ মালের মালিক থেকে নির্দিষ্ট অংশ বের করে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার হকদার বা উপযুক্ত ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়াকে জাকাত বলা হয়। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, এতে 'تمليك' বা মালিক বানিয়ে দেওয়া একটি অপরিহার্য শর্ত।

জাকাত ইসলামের একটি মৌলিক স্তম্ভ এবং এটি হিজরী দ্বিতীয় সনে (২য় হিজরী) রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পূর্বে ফরজ হয়েছে। জাকাত ফরজ হওয়ার পেছনে

অনেক গুরুত্বপূর্ণ 'হিকমত' বা রহস্য রয়েছে। প্রথমত, এটি সম্পদের মোহ থেকে মানুষকে মুক্ত করে এবং আত্মিক পরিশুদ্ধি ঘটায়। দ্বিতীয়ত, এটি সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখে। ধনীদের সম্পদ যখন দরিদ্রদের হাতে পৌঁছায়, তখন সমাজে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায় এবং দারিদ্র্য বিমোচন সহজ হয়। তৃতীয়ত, এটি আল্লাহর প্রতি বান্দার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি মাধ্যম। এটি কেবল দান নয়, বরং দরিদ্রদের জন্য ধনীদের সম্পদে নির্ধারিত একটি পাওনা বা অধিকার। সামগ্রিকভাবে, জাকাত একটি কল্যাণকামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা সমাজের উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করে।

(আ) জাকাত কার ওপর ফরজ? জাকাত ও সদকাতুল ফিতরের নিসাবের পার্থক্য কী? (على من تجب الزكاة ؟ وما الفرق بين نصاب الزكاة وصدقة الفطر ؟)

হানাফী মাযহাব অনুযায়ী, জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য পাঁচটি প্রধান শর্ত রয়েছে। ১. মুসলিম হওয়া (অমুসলিমের ওপর জাকাত নেই)। ২. স্বাধীন হওয়া (ক্রীতদাসের ওপর জাকাত নেই)। ৩. প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধিমান হওয়া। ৪. নিসাব পরিমাণ মালের পূর্ণ মালিকানা থাকা এবং ৫. সেই মাল মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া এবং তার ওপর পূর্ণ এক চন্দ্রবছর অতিবাহিত হওয়া। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণের অতিরিক্ত যদি নিসাব পরিমাণ মাল থাকে, তবেই তার ওপর জাকাত আবশ্যক।

জাকাত ও সদকাতুল ফিতরের নিসাবের মধ্যে সূক্ষ্ম কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। জাকাতের নিসাবের ক্ষেত্রে শর্ত হলো— সম্পদটি 'নামি' বা বর্ধনশীল হতে হবে (যেমন নগদ টাকা, স্বর্ণ-রৌপ্য বা ব্যবসার পণ্য) এবং এর ওপর এক বছর অতিবাহিত হতে হবে। কিন্তু সদকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রে সম্পদের ওপর বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। যদি ঈদের দিন সকালে কারো নিকট তার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ (৫২.৫ তোলা রুপার সমমূল্য) যেকোনো ধরনের সম্পদ থাকে—তা বর্ধনশীল হোক বা না হোক—তবেই তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব হয়। এছাড়া জাকাত কেবল নিজের সম্পদের ওপর দিতে হয়, কিন্তু সদকাতুল ফিতর সামর্থ্যবান ব্যক্তিকে নিজের এবং তার নাবালক সন্তানদের পক্ষ থেকেও আদায় করতে হয়। জাকাত হলো ইসলামের একটি রুকন বা ফরজ, আর সদকাতুল ফিতর হলো ওয়াজিব যা রোজার ত্রুটি-বিচ্যুতি পূরণের জন্য নির্ধারিত।

(ই) পবিত্র কুরআনের আলোকে জাকাতের খাতসমূহ বর্ণনা করো। (بين مصارف الزكاة في ضوء القرآن الكريم .)

পবিত্র কুরআনে জাকাত বণ্টনের জন্য আটটি সুনির্দিষ্ট খাত বা 'مصارف' উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আত-তাওবার ৬০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা এই খাতগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছেন। খাতগুলো হলো: ১. **ফকির (فقراء):** যাদের নিকট সামান্য কিছু আছে কিন্তু নিসাব পরিমাণ নেই। ২. **মিসকিন (مساكين):** যারা অত্যন্ত নিঃস্ব, যাদের কিছুই নেই। ৩. **জাকাত আদায়কারী (عاملين):** ইসলামী রাষ্ট্রে জাকাত সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ। ৪. **চিত্তাকর্ষণ বা অমুসলিমদের মন জয় (مؤلفة القلوب):** যাদের ইসলামের প্রতি আগ্রহী করার প্রয়োজন আছে (হানাফী মতে এই খাতের কার্যকারিতা এখন স্থগিত)। ৫. **দাস মুক্তি (رقاب):** চুক্তিবদ্ধ দাসকে মুক্ত করার জন্য। ৬. **ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (غارمين):** যারা ঋণের ভারে জর্জরিত এবং ঋণ পরিশোধে অক্ষম। ৭. **আল্লাহর পথে (في سبيل الله):** মূলত ইসলামের রক্ষণাবেক্ষণ এবং জিহাদে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য। ৮. **মুসাফির (ابن السبيل):** যে মুসাফির পথে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে, যদিও তার নিজ বাড়িতে সম্পদ থাকে।

হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে 'تمليك' বা উপযুক্ত ব্যক্তিকে সম্পদের মালিক বানিয়ে দেওয়া শর্ত। তাই জাকাতের টাকা দিয়ে মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, রাস্তাঘাট মেরামত বা মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন করা জায়েজ নেই, কারণ সেখানে কোনো ব্যক্তিকে মালিক বানানো হয় না। জাকাতের মূল হকদার হলো সমাজের সেই সব নিঃস্ব মানুষ যারা উপরোক্ত আটটি খাতের অন্তর্ভুক্ত।

(ঈ) সময়ের আগে জাকাত প্রদানের বিধান কী? জাকাত আদায়ে 'মালিকানা শর্ত' (তালিক) নিয়ে মতভেদ কী? (ما حكم أداء الزكاة قبل وقتها ؟ وما الخلاف في شرط التمليك لأداء الزكاة ؟)

নিসাব পূর্ণ হওয়ার পর বছর শেষ হওয়ার আগেই অগ্রিম জাকাত প্রদান করা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী জায়েজ। যদি কোনো ব্যক্তি জানে যে তার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে এবং বছর শেষে তাকে জাকাত দিতে হবে, তবে সে চাইলে রমজান মাসে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই জাকাত আদায় করতে পারে। এটি সওয়াবের কাজ হিসেবে গণ্য হয় এবং বছর শেষে হিসাব করে যদি দেখা যায় জাকাত বেশি দেওয়া হয়েছে, তবে তা পরবর্তী বছরের জন্য সমন্বয় করা যায়।

জাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে 'تمليك' বা কোনো অভাবী ব্যক্তিকে সরাসরি সম্পদের মালিক বানিয়ে দেওয়া হানাফী ফিকহে একটি মৌলিক শর্ত। ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, জাকাত তখনই আদায় হবে যখন সম্পদের মালিকানা দাতার কাছ থেকে গ্রহীতার কাছে হস্তান্তরিত হবে। এ কারণেই হানাফী ফকীহগণ বলেন,

জাকাতের টাকা দিয়ে জনকল্যাণমূলক কাজ যেমন হাসপাতাল, কালভার্ট বা স্কুল নির্মাণ করা যাবে না, কারণ এখানে কোনো নির্দিষ্ট অভাবী ব্যক্তিকে মালিক বানানো হচ্ছে না। তবে ইমাম শাফিঈ ও অন্য কিছু ফকীহদের মতে, জাকাতের উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন, তাই জনহিতকর কাজেও জাকাত ব্যয় করা যেতে পারে বলে তারা মনে করেন। কিন্তু হানাফী মানদণ্ডে জাকাত যেহেতু একটি আর্থিক ইবাদত এবং কুরআনে 'ইতা' (প্রদান করা) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তাই ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া ছাড়া জাকাত আদায় হবে না। এটিই হানাফী ফিকহের সুসংগত ও নির্ভরযোগ্য অবস্থান।

(উ) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী (اكتب نبذة من حياة سيدنا أبي سعيد الخدري (رض).)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) ছিলেন আনসার সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম এবং ফকীহ। তাঁর আসল নাম সা'দ বিন মালিক বিন সিনান। তিনি মদিনার বনু খুদরায় গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মালিক বিন সিনান (রা.) উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। আবু সাঈদ খুদরী (রা.) অত্যন্ত অল্প বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি উহুদ যুদ্ধে অংশ নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কিশোর হওয়ার কারণে নবীজী (সা.) তাঁকে অনুমতি দেননি। পরবর্তীতে খন্দকের যুদ্ধসহ প্রায় বারোটি যুদ্ধে তিনি নবীজী (সা.)-এর সাথে বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন।

তিনি কেবল একজন যোদ্ধাই ছিলেন না, বরং ইসলামের গভীর জ্ঞান বা ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। নবীজী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে তিনি অসংখ্য হাদীস শুনেছিলেন এবং তা মুখস্থ রেখেছিলেন। তিনি মোট ১,১৭০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর 'যুহদ' বা দুনিয়াবিমুখতা এবং ইলম প্রচারের প্রতি একাগ্রতা। মদিনার শিক্ষিত সাহাবীদের মধ্যে তাঁর নাম অগ্রগণ্য ছিল এবং বড় বড় সাহাবীগণ জটিল মাসআলার সমাধানে তাঁর শরণাপন্ন হতেন। হানাফী ফিকহের অনেক মূলনীতিতে তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলো ভিত্তিস্বরূপ কাজ করে। এই মহান সাহাবী হিজরী ৭৪ সনে মদিনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। হাদীস শাস্ত্রের সংরক্ষণ ও প্রসারে তাঁর অবদান মুসলিম উম্মাহর জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হাদীস-৫ এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর হানাফী মাযহাব ও ফিকহী মানদণ্ড অনুযায়ী নিচে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হলো। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী রেফারেন্স নাম্বার বাদ দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি প্রশ্নের পাশে ব্রাকেটে সংশ্লিষ্ট আরবি প্রশ্ন যুক্ত করা হয়েছে।

হাদীস-৪: রমজানের ফজিলত ও শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা

- **উৎস:** এই হাদীসটি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং এটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমসহ প্রধান হাদীস গ্রন্থসমূহে সংকলিত হয়েছে।

- **প্রসঙ্গ:** রমজান মাসের আগমন উপলক্ষে মুমিনদের উৎসাহিত করতে এবং এই মাসের বরকত ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার জন্য নবীজী (সা.) এই ঘোষণা প্রদান করেন।

- **ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ:** হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন— "যখন রমজান মাস আসে, তখন রহমতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়।" (অন্য বর্ণনায় 'জান্নাতের দরজা' খোলার কথা এসেছে)।

- **মন্তব্য:** এই হাদীসটি রমজান মাসের অনন্য মর্যাদা প্রকাশ করে। এটি মুমিনদের জন্য ইবাদতের এক বিশেষ অনুকূল পরিবেশ তৈরির ঘোষণা, যেখানে আল্লাহর রহমত অবারিত থাকে এবং শয়তানের প্ররোচনা সংকুচিত হয়ে আসে।

হাদীস-৪ এর সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর

(অ) রোজার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? রোজা কখন ফরজ হয়েছে? (ما معنى الصوم لغةً وشرعاً ؟ ومتى فرض الصوم ؟)

সাওম (রোজা) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'আল-ইমসাক' বা কোনো কাজ থেকে বিরত থাকা এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। আরবী ভাষায় চুপ থাকাকেও সাওম বলা হয়, যেমনটি হযরত মারিয়াম (আ.)-এর বর্ণনায় কুরআনে এসেছে। শরীয়তের পরিভাষায়, ইবাদতের নিয়তে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, যৌন মিলন এবং রোজা ভঙ্গকারী সকল কাজ থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোজা বলা হয়।

হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, রোজার জন্য 'নিয়ত' করা একটি আবশ্যকীয় শর্ত, যা ছাড়া রোজা সম্পন্ন হয় না।

ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ রুকনটি হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে (২য় হিজরী) শাবান মাসে ফরজ করা হয়েছে। কিবলা পরিবর্তনের ঘটনার অল্প কিছুদিন পর আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার ১৮৩ নম্বর আয়াত নাজিল করেন, যেখানে বলা হয়েছে— "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমনটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর করা হয়েছিল।" হানাফী মাযহাব ও সামগ্রিক ফিকহী মানদণ্ড অনুযায়ী, রমজানের রোজা রাখা 'ফরজে আইন', যা অস্বীকারকারী কাফির এবং বিনা ওজরে ত্যাগকারী ফাসেক ও কঠিন গুনাহগার। ইসলামের ইতিহাসে রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার মাধ্যমে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জনের এক বার্ষিক প্রশিক্ষণ কোর্স নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি কেবল একটি শারীরিক কৃচ্ছসাধন নয়, বরং একটি মহান আধ্যাত্মিক ইবাদত যা বান্দাকে সরাসরি আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যায়।

(আ) "রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা হয়" এর ব্যাখ্যা (اشرح قوله عليه السلام : فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم)

নবীজী (সা.)-এর এই ভাষ্যটি হাকীকত (বাস্তব) এবং মাজায (রূপক) উভয় অর্থেই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। একদল মুহাদ্দিস ও ফকীহদের মতে, রমজান মাসে জান্নাতের দরজাগুলো প্রকৃতপক্ষে বা দৃশ্যত খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বাস্তব অর্থেই বন্ধ রাখা হয়। এটি এই মাসের সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। তবে এর একটি গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হলো— রমজান মাসে মানুষ অধিক পরিমাণে নফল ইবাদত, কোরআন তিলাওয়াত, দান-সদকা এবং তওবায় লিপ্ত হয়। এসব নেক আমল জান্নাতে যাওয়ার পথকে সুগম করে দেয়, তাই একে 'জান্নাত বা রহমতের দরজা খুলে দেওয়া' বলা হয়েছে। অন্যদিকে, রমজানে মানুষ পাপাচার থেকে বিরত থাকে এবং রিপু দমন করে, ফলে জাহান্নামী হওয়ার পথগুলো সংকুচিত হয়ে যায়; আর এটিই হলো 'জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা'।

হানাফী দৃষ্টিভঙ্গিতে, এই হাদীসটি মুমিনদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে ইবাদতে উদ্বুদ্ধ করে। রহমতের দরজা খোলার অর্থ হলো এই মাসে অল্প আমলে অধিক সওয়াব পাওয়া

এবং আল্লাহর বিশেষ ক্ষমা ও দয়া লাভ করা। এই সময়ে শয়তানের প্রভাব কম থাকায় ইবাদতের পরিবেশ সহজতর হয়। জাহান্নামের দরজা বন্ধ হওয়ার মানে হলো গুনাহের আকর্ষণ কমে যাওয়া। যারা প্রকৃত রোজাদার, তাদের জন্য সারা মাসই রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের এক অফুরন্ত ধারা প্রবাহিত হয়। মূলত আল্লাহ তায়ালা রমজান মাসে তাঁর বান্দাদের জান্নাতের দিকে আহ্বান করেন এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার সুযোগ করে দেন। এই হাদীসটি উম্মতকে অলসতা ঝেড়ে ফেলে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করার এক শক্তিশালী বার্তা প্রদান করে।

(ই) শয়তান বন্দি থাকলে মানুষ কেন রমজানে পাপ করে? (إذا سلسلت الشياطين فكيف يذنب الناس في رمضان ؟)

হাদীসে বলা হয়েছে যে রমজান মাসে শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় অনেকে রমজানেও পাপে লিপ্ত হয়। এর ব্যাখ্যাকারে হানাফী উলামায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসগণ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন। প্রথমত, মানুষের পাপে লিপ্ত হওয়ার একমাত্র কারণ শয়তান নয়, বরং মানুষের নিজের ভেতরে থাকা **'নফস' বা কুপ্রবৃত্তি** একটি বড় কারণ। দীর্ঘ এগারো মাস শয়তানের প্ররোচনায় মানুষের নফস পাপে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে রমজানে শয়তান বন্দি থাকলেও সেই পুরাতন অভ্যাসের তাড়নায় মানুষ পাপাচার করে। দ্বিতীয়ত, হাদীসে 'শয়তান' বলতে সব শয়তানকে বোঝানো হয়নি, বরং **'মারাদাতুল জিন'** বা অবাধ্য ও শক্তিশালী শয়তানদের বন্দি করার কথা বলা হয়েছে। সাধারণ ও ছোট ছোট শয়তানরা মুক্ত থাকতে পারে যারা মানুষকে কুমন্ত্রণা দেয়।

তৃতীয়ত, এটি একটি আধ্যাত্মিক প্রভাবের বিষয়। যারা নিষ্ঠার সাথে রোজা রাখে এবং রোজার পূর্ণ আদব রক্ষা করে, তাদের জন্য শয়তানের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যারা কেবল ক্ষুধার্ত থাকে আর মিথ্যা, গীবত ও হারাম কাজে লিপ্ত থাকে, তাদের ওপর নফসের প্রভাব প্রবল থাকে। শয়তান বন্দি হওয়ার অর্থ হলো তার ক্ষমতা কমিয়ে দেওয়া বা তার চলাচল সীমিত করা, যাতে সে অন্য সময়ের মতো সহজে বিভ্রান্ত করতে না পারে। যেমন— একটি কুকুরকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলে সে দূর থেকে ঘেউ ঘেউ করতে পারে কিন্তু কাছে এসে কামড়াতে পারে না। তেমনি শয়তান দূরে থাকলেও তার পূর্ববর্তী প্রভাব এবং মানুষের দুর্বল সংকল্পের কারণে পাপাচার সংঘটিত

হয়। সুতরাং পাপের জন্য কেবল শয়তান নয়, মানুষের নিজস্ব নফস ও অসচেতনতাই প্রধানত দায়ী।

(ঈ) রোজা পালনের উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করো (اكتب مقاصد مشروعية الصوم)

রোজার বিধান দেওয়ার পেছনে মহান আল্লাহর অনেকগুলো সুউচ্চ উদ্দেশ্য বা 'মাকাসিদ' রয়েছে। প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো **তাকওয়া অর্জন করা**। পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "যাতে তোমরা তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করতে পারো।" রোজা মানুষের পশুবৃত্তিকে দমন করে এবং আধ্যাত্মিক শক্তিকে জাগ্রত করে, যার ফলে বান্দা গুনাহের কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করার সক্ষমতা লাভ করে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো **নফসের পরিশুদ্ধি**। মানুষের কাম-ক্রোধ ও প্রবৃত্তির লালসা কেবল ক্ষুধার মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। রোজা মানুষকে ধৈর্য ও আত্মসংযম শেখায়।

তৃতীয়ত, রোজার মাধ্যমে **দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা** সৃষ্টি হয়। একজন ধনী ব্যক্তি যখন দীর্ঘ সময় ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকে, তখন সে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করতে পারে। এটি তাকে দান-সদকা ও মানবিক কাজে উৎসাহিত করে। চতুর্থত, **শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা**। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানও স্বীকার করেছে যে, বছরের নির্দিষ্ট সময় রোজা রাখা শরীরের বিষাক্ত পদার্থ নির্গমনে এবং পরিপাকতন্ত্রের বিশ্রামে সহায়ক। পঞ্চমত, **আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা**। সারাদিন তৃষ্ণার্ত থাকার পর এক ঢোক পানি যখন বান্দার কণ্ঠে পৌঁছায়, তখন সে আল্লাহর ছোট ছোট নিয়ামতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। সামগ্রিকভাবে, রোজা কেবল একটি উপবাস নয়, বরং এটি একজন মুমিনকে ধৈর্যশীল, দয়ালু, স্বাস্থ্যবান এবং সর্বোপরি একজন সত্যিকারের মুত্তাকী মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার এক ঐশী পরিকল্পনা।

(উ) 'ইয়াওমুশ শাক' কী এবং এই দিনে রোজা রাখার বিধান কী? (ما هو يوم الشك ؟ وما حكم الصوم فيه ؟)

'ইয়াওমুশ শাক' বা সন্দেহের দিন বলতে শাবান মাসের ৩০ তারিখকে বোঝানো হয়। যদি ২৯শে শাবান সন্ধ্যায় মেঘ বা কুয়াশার কারণে আকাশ পরিষ্কার না থাকে

এবং চাঁদ দেখা না যায়, তবে পরের দিনটি (৩০শে শাবান) রমজানের শুরু নাকি শাবানের শেষ—তা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এই দিনটিকেই শরীয়তের পরিভাষায় 'ইয়াওমুশ শাক' বলা হয়।

হানাফী মাযহাব ও ফিকহী মানদণ্ড অনুযায়ী, ইয়াওমুশ শাক বা সন্দেহের দিনে 'রমজানের রোজা' মনে করে রোজা রাখা **মাকরুহে তাহরীমী** বা নিষিদ্ধ। নবীজী (সা.) স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন যে, তোমরা রমজানের একদিন বা দুইদিন আগে রোজা শুরু করো না (ব্যতিক্রম কেবল তাদের জন্য যাদের নিয়মিত নফল রোজার তারিখ ওই দিনে পড়ে)। এর মূল হিকমত বা কারণ হলো— ফরজ ইবাদত এবং নফল ইবাদতের মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রাখা। যেন মানুষ নিজের পক্ষ থেকে দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সংযোজন না করে। তবে কেউ যদি ওই দিনে রমজানের রোজা না রেখে কেবল সাধারণ নফল হিসেবে রোজা রাখে, তবে হানাফী মতে তা জায়েজ হতে পারে, কিন্তু রমজানের নিয়ত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যদি ওই দিন রোজা রাখা হয় এবং পরে জানা যায় যে চাঁদ দেখা গিয়েছিল ওটি রমজানেরই দিন ছিল, তবে হানাফী ফিকহ অনুযায়ী তা রমজানের রোজা হিসেবে গণ্য হবে। তবে সতর্কতা হলো, সন্দেহের দিনে রোজা না রেখে পরবর্তী দিনের জন্য অপেক্ষা করা এবং নিশ্চিত হয়ে আমল করা। এটিই সুন্নাহর সঠিক পথ।

হাদীস-৫: রমজানের ফজিলত ও শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা

- **উৎস:** এই হাদীসটি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁদের সহীহ গ্রন্থসমূহে সংকলন করেছেন।

- **প্রসঙ্গ:** রমজান মাসের আগমন উপলক্ষে উম্মতকে এই মাসের বিশেষ মর্যাদা, রহমত এবং ইবাদতের অনুকূল পরিবেশ সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য নবীজী (সা.) এই কথাগুলো ইরশাদ করেন।

- **ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ:** হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন: "যখন রমজান মাস আসে, তখন রহমতের (জান্নাতের) দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ (বন্দি) করা হয়।"

- **মন্তব্য:** এই হাদীসটি রমজান মাসের অনন্য আধ্যাত্মিক পরিবেশের চিত্র তুলে ধরে। এটি মুমিনদের জন্য ইবাদতে মনোযোগী হওয়ার এবং পাপাচার বর্জন করার একটি বিশেষ উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করে।

হাদীস-৫ এর সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর

(অ) রোজার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? রোজা কখন ফরজ হয়েছে? (ما معنى الصوم لغة وشرعاً ؟ ومتى فرض الصوم ؟)

সাওম (রোজা) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'ইমসাক' বা বিরত থাকা। যেকোনো কাজ থেকে বিরত থাকাকেই আভিধানিক অর্থে সাওম বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায়, ইবাদতের নিয়তে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নামই হলো রোজা। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, রোজার জন্য 'নিয়াত' করা একটি অপরিহার্য শর্ত; নিয়ত ছাড়া সারা দিন না খেয়ে থাকলেও তা শরয়ী রোজা হিসেবে গণ্য হবে না।

রোজা ইসলামের পাঁচটি মৌলিক স্তম্ভের অন্যতম। এটি দ্বিতীয় হিজরী সনের শাবান মাসে উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপর ফরজ করা হয়েছে। কিবলার পরিবর্তনের পরপরই মহান আল্লাহ রোজার বিধান নাজিল করেন। এর আগে আশুরার রোজা পালনের

বিধান থাকলেও রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর তা নফল হিসেবে গণ্য হতে থাকে। হানাফী মাযহাবের মতে, রমজানের রোজা রাখা 'ফরজে আইন', যা অস্বীকার করা কুফরি এবং বিনা ওজরে ত্যাগ করা কঠিন গুনাহের কাজ। এটি কেবল উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপরই নয়, বরং পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপরও ফরজ ছিল, যা কুরআন মাজীদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রোজা মানুষের নফস বা কুপ্রবৃত্তিকে দমন করার এবং তাকওয়া অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

(আ) "রহমতের দরজা খুলে দেওয়া এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করার" ব্যাখ্যা (. اشرح قوله عليه السلام : فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم)

নবীজী (সা.)-এর এই বাণীর দুটি ব্যাখ্যা মুহাদ্দিসগণ প্রদান করেছেন। প্রথমত, এর একটি বাহ্যিক বা হাকীকী অর্থ রয়েছে; অর্থাৎ রমজান মাস শুরু হওয়ার সাথে সাথে মহান আল্লাহ বাস্তবিকই জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেন এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেন। এটি এই মাসের সম্মান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ। দ্বিতীয়ত, এর একটি আলঙ্কারিক বা রূপক অর্থ রয়েছে। 'রহমতের দরজা খুলে দেওয়া' মানে হলো এই মাসে নেক আমল ও ইবাদতের সুযোগ অবারিত করে দেওয়া হয়। মানুষ এই মাসে অন্য মাসের তুলনায় বেশি দান-সদকা, তিলাওয়াত ও নামাজ পড়ার সুযোগ পায়, যার ফলে জান্নাতে যাওয়ার পথ সহজ হয়।

অন্যদিকে, 'জাহান্নামের দরজা বন্ধ করার' অর্থ হলো রমজানে শয়তানের প্ররোচনা কমে যাওয়া এবং মানুষের মধ্যে পাপাচারের প্রবণতা হ্রাস পাওয়া। রোজা রাখার কারণে মানুষের পাশবিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে গুনাহের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। হানাফী ফিকহ ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়, এই ঘোষণাটি মুমিনদের জন্য একটি মনস্তাত্ত্বিক বিজয়। যখন কোনো মুমিন জানে যে তার জন্য জান্নাতের দুয়ার উন্মুক্ত, তখন সে আরও বেশি উৎসাহের সাথে ইবাদতে মগ্ন হয়। এটি মূলত আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ সাধারণ ক্ষমা ও রহমতের আবহ যা পুরো মাস জুড়ে বিরাজ করে। জান্নাতের দরজা খোলার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে কবুলিয়তের এক বিশেষ পরিবেশ তৈরি করা হয়।

(ই) শয়তান বন্দি থাকলে মানুষ কেন রমজানে পাপ করে? (إذا سلسلت الشياطين فكيف يذنب الناس في رمضان ؟)

হাদীসে বলা হয়েছে রমজানে শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়, তবুও সমাজে পাপাচার দেখা যায়—এর কয়েকটি চমৎকার ব্যাখ্যা ফকীহগণ দিয়েছেন। প্রথমত, মানুষের পাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য কেবল শয়তানই দায়ী নয়, বরং মানুষের ভেতরে থাকা

'নফস' বা কুপ্রবৃত্তি একটি বড় কারণ। দীর্ঘ এগারো মাস শয়তানের প্ররোচনায় মানুষের নফস পাপে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। রমজানে শয়তান বন্দি থাকলেও সেই অর্জিত কু-অভ্যাসের কারণে মানুষ গুনাহ করে ফেলে। এটি অনেকটা চলন্ত পাখা বন্ধ করার পরও কিছুক্ষণ ঘুরতে থাকার মতো।

দ্বিতীয়ত, মুহাদ্দিসগণের মতে, হাদীসে 'শয়তান' বলতে সকল শয়তানকে বোঝানো হয়নি; বরং **'মারাদাতুল জিন'** বা অত্যন্ত শক্তিশালী ও অবাধ্য শয়তানদের বন্দি করার কথা বলা হয়েছে। সাধারণ ছোটখাটো শয়তানরা মুক্ত থাকতে পারে যারা মানুষকে প্ররোচিত করে। তৃতীয়ত, শয়তান বন্দি হওয়ার অর্থ হলো তার ক্ষমতা ও প্রভাব কমিয়ে দেওয়া। রোজা রাখার কারণে মানুষের রক্ত চলাচল ও জৈবিক উত্তেজনা স্থিমিত হয়, যা শয়তানের চলাচলের পথকে রুদ্ধ করে দেয়। চতুর্থত, যারা রোজা রাখে না বা রোজার আদব রক্ষা করে না, শয়তান তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। হানাফী মাযহাবের আলোকে এটি স্পষ্ট যে, রমজানে গুনাহ হওয়ার জন্য মানুষের নফস ও দীর্ঘদিনের কু-অভ্যাসই প্রধানত দায়ী। শয়তান বন্দি হওয়ার ফলে পাপের পরিমাণ অন্য মাসের তুলনায় অনেক কমে যায়, যা আমরা বাস্তব সমাজেই পর্যবেক্ষণ করি।

(ঈ) রোজা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করো (اكتب مقاصد مشروعية الصوم .)

ইসলামে রোজা প্রবর্তনের বা ফরজিয়তের পেছনে বহুমুখী উদ্দেশ্য ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো **'তাকওয়া' বা খোদাভীতি অর্জন করা**। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে, "যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।" রোজার মাধ্যমে বান্দা তার প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষাকে আল্লাহর আদেশের অনুগত করতে শেখে। দিনের বেলা হালাল খাবার সামনে থাকা সত্ত্বেও কেবল আল্লাহর ভয়ে তা স্পর্শ না করার মাধ্যমে বান্দার আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তৈরি হয়।

দ্বিতীয়ত, রোজার একটি বড় সামাজিক উদ্দেশ্য হলো দরিদ্র ও অনাহারী মানুষের দুঃখ-কষ্ট উপলব্ধি করা। সারা দিন অভুক্ত থাকার ফলে একজন ধনী ব্যক্তি অনুধাবন করতে পারেন ক্ষুধার যন্ত্রণা কত তীব্র, যা তাকে অসহায় মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দানশীল করে তোলে। তৃতীয়ত, এটি আত্মশুদ্ধির একটি মোক্ষম হাতিয়ার। রোজা মানুষের অন্তরের কলুষতা দূর করে এবং রুহ বা আত্মাকে শক্তিশালী করে। চতুর্থত, রোজার বৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্যগত উপকারিতা অপরিসীম। এটি শরীরের পরিপাকতন্ত্রকে বিশ্রাম দেয় এবং দেহ থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করতে সাহায্য করে। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, রোজার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালের কঠিন হাশরের ময়দানে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া। মূলত রোজা একজন মানুষকে পশুর

স্তর থেকে উন্নীত করে ইনসানিয়াত বা মানবতার উচ্চতর স্তরে নিয়ে যায় এবং তাকে ইবাদতের কঠোর সাধনায় অভ্যস্ত করে তোলে।

(উ) 'ইয়াওমুশ শাক' কী এবং এই দিনে রোজার বিধান কী? (ما هو يوم الشك ؟ وما حكم الصوم فيه ؟)

'ইয়াওমুশ শাক' বা সন্দেহের দিন বলতে শাবান মাসের ৩০ তারিখকে বোঝানো হয়। যদি ২৯শে শাবান সন্ধ্যায় মেঘ বা কুয়াশার কারণে আকাশ পরিষ্কার না থাকে এবং রমজানের চাঁদ দেখা না যায়, তবে পরের দিনটি (৩০শে শাবান) রমজান কি না—এই নিয়ে মানুষের মনে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়, সেই দিনটিই হলো ইয়াওমুশ শাক। অর্থাৎ, দিনটি কি শাবানের ৩০ তারিখ নাকি রমজানের ১ তারিখ, এই সংশয়পূর্ণ দিনকে ইয়াওমুশ শাক বলা হয়।

হানাফী মাযহাব ও সুন্নাহর মানদণ্ড অনুযায়ী, ইয়াওমুশ শাক-এ রমজানের রোজা মনে করে রোজা রাখা **মাকরুহে তাহরীমী** বা নিষিদ্ধ। নবীজী (সা.) ইরশাদ করেছেন, "তোমরা রমজানের একদিন বা দুইদিন আগে থেকে রোজা শুরু করো না।" এর উদ্দেশ্য হলো ফরজ ইবাদত এবং নফল ইবাদতের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখা। তবে যদি কারো নিয়মিত নফল রোজা রাখার অভ্যাস থাকে (যেমন প্রতি সোমবার বা বৃহস্পতিবারের রোজা) এবং তা কাকতালীয়ভাবে সেই দিন পড়ে যায়, তবে তার জন্য রোজা রাখা জায়েজ। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, সেই দিন দুপুরের আগে যদি চাঁদ দেখার সংবাদ পাওয়া যায়, তবে রোজার নিয়ত করে নিতে হবে। কিন্তু নিশ্চিত না হয়ে রমজানের নিয়তে রোজা রাখা থেকে বিরত থাকতে হবে। সতর্কতার অজুহাতে দ্বীনের সীমানা লঙ্ঘন করা ইসলামের শিক্ষা নয়। বরং শাবান মাসকে ৩০ দিন পূর্ণ করে রমজান শুরু করাই হলো সুন্নাহ সম্মত বিধান।

হাদীস-৭ এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর হানাফী মাযহাব ও ফিকহী মানদণ্ড অনুযায়ী নিচে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হলো। আপনার পূর্বের অনুরোধ অনুযায়ী এখানে কোনো রেফারেন্স নাম্বার ব্যবহার করা হয়নি এবং প্রতিটি প্রশ্নের পাশে ব্রাকেটে সংশ্লিষ্ট আরবি প্রশ্ন যুক্ত করা হয়েছে।

হাদীস-৬ এর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর হানাফী মাযহাব ও ফিকহী মানদণ্ড অনুযায়ী নিচে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হলো। আপনার পূর্বের অনুরোধ অনুযায়ী রেফারেন্স নাম্বার বাদ দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি প্রশ্নের পাশে ব্রাকেটে সংশ্লিষ্ট আরবি প্রশ্ন যুক্ত করা হয়েছে।

হাদীস-৬: বিয়ে ও যুবসমাজের প্রতি নবীজী (সা.)-এর নির্দেশনা

- **উৎস:** এই হাদীসটি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমসহ সকল প্রধান হাদীস গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

- **প্রসঙ্গ:** একদা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) যুবকদের একটি দলের সাথে ছিলেন এবং নবীজী (সা.)-এর এই কালজয়ী উপদেশটি বর্ণনা করেন। মূলত যুবসমাজের চরিত্র রক্ষা এবং একটি সুস্থ সমাজ গঠনের লক্ষ্যে নবীজী (সা.) বিয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

- **ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ:** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন: "হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার বিয়ের সামর্থ্য (শারীরিক ও আর্থিক) আছে, সে যেন বিয়ে করে। কেননা বিয়ে চোখের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করে। আর যার বিয়ের সামর্থ্য নেই, সে যেন রোজা রাখে। কেননা রোজা তার যৌন উত্তেজনা দমনকারী বা নিস্তেজকারী।"

- **মন্তব্য:** এই হাদীসটি বিয়ের গুরুত্ব ও চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষার একটি চমৎকার দিকনির্দেশনা। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলাম কেবল আধ্যাত্মিকতা নয়, বরং মানুষের স্বাভাবিক জৈবিক ও সামাজিক চাহিদাকে পবিত্র পন্থায় সমাধানের নির্দেশ দেয়।

হাদীস-৬ এর সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর

(অ) বিয়ের বৈধতা, শর্তাবলি ও হুকুম (اذكر مشروعية النكاح وشروطه وحكمه)

ইসলামে বিয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি কেবল একটি সামাজিক চুক্তি নয়, বরং এটি মহান নবীদের সুন্নাত এবং একটি ইবাদত। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বিয়ে করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং একে প্রশান্তির মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, বিয়ের জন্য প্রধানত তিনটি মৌলিক শর্ত (শুরুত) রয়েছে: ১. ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও গ্রহণ), যা একই মজলিসে হতে হবে। ২. সাক্ষী থাকা (কমপক্ষে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন নারী সাক্ষী হতে

হবে)। ৩. মোহর নির্ধারণ করা (যদিও এটি বিয়ের মূল রুকন নয়, তবে বিয়ের একটি আবশ্যকীয় দাবি)।

বিয়ের হুকুম বা বিধান ব্যক্তির অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন হতে পারে। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী, স্বাভাবিক অবস্থায় বিয়ে করা **'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ'**। যদি কারো কামভাব প্রবল হয় এবং বিয়ে না করলে পাপে (যিনা) লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে, তবে তার জন্য বিয়ে করা **'ওয়াজিব'**। আবার যদি কারো মনে হয় সে স্ত্রীর হক আদায় করতে পারবে না বা জুলুম করবে, তবে তার জন্য বিয়ে করা **'মাকরুহ'**। তবে সাধারণভাবে যুবকদের জন্য বিয়ে করাকে উৎসাহিত করা হয়েছে যাতে তারা চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে বাঁচতে পারে। এটি একটি বরকতময় বন্ধন যা মানুষকে ঈমানের অর্ধেক পূর্ণ করতে সাহায্য করে। বিয়ের মাধ্যমে একটি পরিবার গঠিত হয় যা ইসলামী সমাজের মূল ভিত্তি।

(আ) "রোজা তার জন্য যৌন উত্তেজনা দমনকারী" এর ব্যাখ্যা (اشرح قوله عليه السلام : " فإنه له وجاء " .)

হাদীসে উল্লেখিত **'উইজা' (وجاء)** শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কোনো পশুকে নপুংসক করা বা তার অণ্ডকোষ পিষে ফেলা যাতে তার প্রজনন ক্ষমতা বা কামভাব চিরতরে চলে যায়। নবীজী (সা.) এখানে শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি বুঝিয়েছেন যে, যদি কোনো যুবক বিয়ের সামর্থ্য না রাখে, তবে সে যেন রোজা রাখে। কারণ রোজা মানুষের বীর্য ও রক্ত প্রবাহকে ধীর করে দেয় এবং নফস বা কুপ্রবৃত্তিকে দুর্বল করে ফেলে। ফলে মানুষের মনে যৌন লালসা বা উত্তেজনার যে দহন সৃষ্টি হয়, রোজা তা প্রশমিত করতে সাহায্য করে।

হানাফী মুহাদ্দিসগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন, বিয়ের বিকল্প হিসেবে রোজা রাখা একটি আত্মিক চিকিৎসা। এটি মানুষের মাঝে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি জাগ্রত করে। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কারণে মানুষের জৈবিক চাহিদাগুলো নিস্তেজ হয়ে পড়ে, যা তাকে হারামের পথে পা বাড়ানো থেকে রক্ষা করে। নবীজী (সা.) 'উইজা' শব্দের মাধ্যমে এটিই বুঝিয়েছেন যে, রোজা মানুষের শাহওয়াত বা কামভাবকে এমনভাবে দমন করে যেমনটি নপুংসক করার মাধ্যমে হয়, কিন্তু এটি একটি সাময়িক ও আধ্যাত্মিক পদ্ধতি। এটি যুবকদের জন্য একটি চারিত্রিক সুরক্ষা কবচ। যারা সামর্থ্যহীন, তাদের জন্য এই সুন্নাহটি পালন করা চারিত্রিক দৃঢ়তা রক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়।

(ই) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিয়ের উপকারিতা (بين فوائد النكاح في ضوء القرآن والسنة .)

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিয়ের বহুমুখী উপকারিতা রয়েছে। প্রথমত, বিয়ে মানুষের মনের **প্রশান্তি ও মানসিক স্থিরতা** দান করে। কুরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা একে অপরের কাছে প্রশান্তি পাও। দ্বিতীয়ত, এটি **চরিত্র রক্ষা ও লজ্জাস্থানের পবিত্রতার** সবচেয়ে বড় ঢাল। নবীজী (সা.) বলেছেন, বিয়ের মাধ্যমে চোখের দৃষ্টি ও চরিত্র সংরক্ষিত হয়। আজকের ফিতনার যুগে এটি পাপাচার থেকে বাঁচার শ্রেষ্ঠ উপায়। তৃতীয়ত, বিয়ের মাধ্যমে **বৈধ পন্থায় বংশ বিস্তার** ঘটে। নবীজী (সা.) হাশরের ময়দানে তাঁর উম্মতের আধিক্য নিয়ে গর্ব করবেন, তাই সৎ ও নেক সন্তান জন্ম দেওয়া একটি বড় সওয়াবের কাজ।

চতুর্থত, বিয়ে মানুষের **রিজিক বা উপার্জনে বরকত** আনে। মহান আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, যারা অভাবী তারা বিয়ে করলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের সচ্ছলতা দান করবেন। পঞ্চমত, এটি একটি **সামাজিক বন্ধন** তৈরি করে। বিয়ের মাধ্যমে দুটি অপরিচিত পরিবারের মধ্যে গভীর আত্মীয়তা ও ভালোবাসার সৃষ্টি হয়, যা সামাজিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বকে শক্তিশালী করে। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, বিয়ের মাধ্যমে একজন পুরুষ দায়িত্বশীল হতে শেখে এবং তার কর্মে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। এটি কেবল ব্যক্তিগত সুখ নয়, বরং একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ বিনির্মাণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এক কথায়, বিয়ে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন নাজাতের একটি পবিত্র মাধ্যম।

(ঈ) বিয়েতে লিপ্ত হওয়া উত্তম নাকি ইবাদতে মগ্ন হওয়া? (الاشتغال بالنكاح أفضل أم التخلى في العبادات ؟ بين .)

হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ ও মুহাদ্দিসের মতে, স্বাভাবিক অবস্থায় নফল ইবাদতে মগ্ন থাকার চেয়ে **বিয়ে করা এবং পারিবারিক দায়িত্ব পালন করা অধিক উত্তম**। এর কারণ হলো, নফল ইবাদতের উপকারিতা কেবল ব্যক্তির নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ, কিন্তু বিয়ের উপকারিতা ও হিকমত সুদূরপ্রসারী। বিয়ের মাধ্যমে একজন মানুষ নিজেকে গুনাহ থেকে রক্ষা করে, যা তার ঈমান রক্ষার জন্য অপরিহার্য। এছাড়া নেক সন্তান লাভ এবং স্ত্রীর হক আদায়ের মাধ্যমে যে সওয়াব পাওয়া যায়, তা অনেক সময় একাকী নফল ইবাদতের চেয়ে বেশি হয়।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, বিয়ে করা একটি সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ যা পালন করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। তবে যদি কোনো ব্যক্তি এমন হয় যে, সে বিয়ের কারণে তার ফরজ ইবাদত বা দ্বীনী দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত হবে, তবে তার জন্য ইবাদতে মগ্ন থাকা অগ্রাধিকার পেতে পারে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সমাজ সংস্কার ও চারিত্রিক পবিত্রতার স্বার্থে বিয়ে করাই অগ্রগণ্য। কারণ বিয়ে নিজেই

একটি ইবাদত। নবীজী (সা.) স্বয়ং বিয়ে করেছেন এবং যারা সংসার ত্যাগ করে কেবল ইবাদতে মগ্ন থাকতে চেয়েছিল, তিনি তাদের সতর্ক করে বলেছেন যে, এটি তাঁর সুন্নাত নয়। সুতরাং সুন্নাহর অনুসরণ এবং সমাজের নৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিয়ের গুরুত্ব নফল ইবাদতের চেয়ে বেশি।

(উ) বর্তমানে বিয়ে নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কার ও প্রথা (ما هي الخرافات والرسومات المروجة في النكاح في العصر الراهن ؟ بين .)

বর্তমান যুগে মুসলিম সমাজে বিয়েকে কেন্দ্র করে অনেক অনৈসলামিক কুসংস্কার ও বিদআত অনুপ্রবেশ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো **যৌতুক প্রথা**। ছেলে পক্ষ থেকে মেয়ের বাবার ওপর টাকার বা আসবাবপত্রের চাপ দেওয়া একটি জুলুম যা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। দ্বিতীয়ত, **বিলাসবহুল অনুষ্ঠান ও অপচয়**। বিয়ের প্যান্ডেল, আলোকসজ্জা এবং খানাপিনায় যে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়, তা শরীয়তের অপচয়ের সংজ্ঞায় পড়ে। অথচ নবীজী (সা.) বলেছেন, সেই বিয়ে সবচেয়ে বেশি বরকতময় যা সবচেয়ে কম খরচে সম্পন্ন হয়।

তৃতীয়ত, **গান-বাজনা ও বেপর্দা পরিবেশ**। বর্তমানে বিয়ে মানেই ডিজে গান, নাচ এবং নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, যা বরকতময় একটি ইবাদতকে গুনাহের উৎসবে পরিণত করে। চতুর্থত, **অসাধ্য মোহর নির্ধারণ**। সামাজিক লোকদেখানোর জন্য সামর্থ্যের অতিরিক্ত মোহর ধার্য করা হয়, যা পরবর্তীতে স্বামী পরিশোধ করতে পারে না। পঞ্চমত, **হলুদ অনুষ্ঠান বা মেহেন্দির নামে ভিনদেশি প্রথা** অনুসরণ করা, যেখানে বিভিন্ন কুসংস্কারমূলক আচার পালন করা হয়। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, বিয়ে হওয়া উচিত অত্যন্ত সহজ ও সুন্নাহ সম্মত পদ্ধতিতে। এই সব বিজাতীয় সংস্কৃতি ও সামাজিক প্রথা বিয়ের বরকতকে নষ্ট করে দেয় এবং সমাজে বিবাহবিচ্ছেদের হার বাড়িয়ে দেয়। তাই এসব বর্জন করে সুন্নাহ অনুযায়ী সাদা-মাটা বিয়ে করাই ঈমানদারদের কাজ।

হাদীস-৭: বিয়ে ও যুবসমাজের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা

- **উৎস:** এই হাদীসটি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং এটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁদের সহীহ গ্রন্থসমূহে সংকলন করেছেন।
- **প্রসঙ্গ:** যুবকদের চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা এবং জৈবিক চাহিদাকে সঠিক পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে নবীজী (সা.) এই গুরুত্বপূর্ণ নসিহতটি প্রদান করেন। এটি পারিবারিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার অন্যতম মূলভিত্তি।
- **ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ:** হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করেছেন: "হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার 'বাআত' বা সামর্থ্য (শারীরিক ও আর্থিক) আছে, সে যেন বিয়ে করে। কারণ, এটি দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করে। আর যার বিয়ের সামর্থ্য নেই, সে যেন রোজা রাখে; কেননা রোজা তার যৌন উত্তেজনা দমনের মাধ্যম (ঢাল) স্বরূপ।"
- **মন্তব্য:** এই হাদীসটি যুবসমাজকে অশ্লীলতা ও চারিত্রিক পতন থেকে রক্ষার এক কার্যকর প্রেসক্রিপশন। এতে বিয়ের উপকারিতা এবং সামর্থ্য না থাকলে সংযম অবলম্বনের পদ্ধতি শেখানো হয়েছে।

হাদীস-৭ এর সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর

(অ) নিকাহ-এর বৈধতা, শর্তাবলি ও হুকুম (اذكر مشروعية النكاح وشروطه وحكمه)

ইসলামী শরীয়তে নিকাহ বা বিয়ে কেবল একটি চুক্তি নয়, বরং এটি একটি মহান ইবাদত ও নবীদের সুন্নাত। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এবং অসংখ্য হাদীসে বিয়ের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, বিয়ের জন্য কিছু মৌলিক শর্ত (আরকান ও শরাইত) রয়েছে। প্রধান শর্ত হলো— ইজাব ও কবুল (প্রস্তাব ও গ্রহণ)। এটি অন্তত দুইজন স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকসম্পন্ন মুসলিম পুরুষ সাক্ষী অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষীর উপস্থিতিতে হতে হবে। এছাড়া কনে বা পাত্রীর অনুমতি এবং মোহরানা নির্ধারণ করাও বিয়ের আবশ্যিক শর্ত।

বিয়ের হুকুম বা বিধান ব্যক্তির অবস্থার ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন হয়। ১. **সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ:** স্বাভাবিক অবস্থায় যখন কারো পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা নেই এবং সে স্ত্রীর হক আদায়ের সামর্থ্য রাখে, তখন বিয়ে করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। ২. **ওয়াজিব:** যদি কারো বিয়ের সামর্থ্য থাকে এবং বিয়ে না করলে পাপে (যেনা) লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে, তবে তার ওপর বিয়ে করা ওয়াজিব। ৩. **হারাম বা মাকরুহ:** যদি কেউ নিশ্চিতভাবে জানে যে সে স্ত্রীর ওপর জুলুম করবে বা তার ভরণপোষণ দিতে অক্ষম, তবে তার জন্য বিয়ে করা জায়েজ নয়। হানাফী মাযহাবের মতে, বিয়ে একটি মুআমালা (লেনদেন) হলেও এর মধ্যে ইবাদতের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, কারণ এটি ঈমান রক্ষা ও বংশধারা পবিত্র রাখার মাধ্যম।

(আ) "ফাইননাহু লাহু উইজাউন"-এর ব্যাখ্যা (اشرح قوله عليه السلام : " فإنه له وجاء " .)

হাদীসের শেষ অংশে নবীজী (সা.) বলেছেন, "ফাইননাহু লাহু উইজাউন" (فإنه له وجاء)। আভিধানিক অর্থে 'উইজা' বলা হয় কোনো পশুর অণ্ডকোষ পিষে দেওয়া বা পুরুষত্বহীন করে দেওয়াকে, যাতে তার প্রজনন ক্ষমতা ও যৌন উত্তেজনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এই হাদীসে শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নবীজী (সা.) বুঝাতে চেয়েছেন যে, রোজা মানুষের কামভাব বা যৌন উত্তেজনাকে এমনভাবে দমন করে যেমনটি উইজা বা খাসি করা পশুর উত্তেজনা স্তিমিত থাকে।

এর বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হলো— রোজা রাখলে মানুষের শরীরের পুষ্টি ও রক্ত চলাচল সীমিত হয়, যা সরাসরি কামভাবের ওপর প্রভাব ফেলে। যখন মানুষ ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত থাকে, তখন তার নফস বা কুপ্রবৃত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে পাপাচারের প্রতি তার ঝোঁক কমে যায়। হানাফী ফিকহবিদগণ বলেন, যারা বিয়ের সামর্থ্য রাখে না, তাদের জন্য নফল রোজা রাখা একটি রক্ষাকবচ। এটি কেবল ধর্মীয় সওয়াবই দেয় না, বরং যুবকদের চারিত্রিক পতন থেকে রক্ষা করার একটি ঢাল হিসেবে কাজ করে। এই বিশেষ শব্দটি ব্যবহার করে নবীজী (সা.) অত্যন্ত চমৎকারভাবে বুঝিয়েছেন যে, রোজা জৈবিক চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য একটি কার্যকরী ও নির্দোষ পদ্ধতি। তাই সামর্থ্যহীনদের জন্য রোজা রাখা অপরিহার্য।

(ই) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিয়ের উপকারিতা (بين فوائد النكاح في ضوء القرآن والسنة .)

কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিয়ের উপকারিতা বহুমুখী। প্রথমত, এটি **মানসিক প্রশান্তি ও ভালোবাসার উৎস**। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "তিনি

তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন।" দ্বিতীয়ত, বিয়ে **দৃষ্টির হেফজ ও চারিত্রিক পবিত্রতা** রক্ষা করে। হাদীসে এসেছে, বিয়ে হলো দৃষ্টিকে অবনত রাখার এবং লজ্জাস্থানকে রক্ষা করার সর্বোত্তম মাধ্যম। এটি সমাজকে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত রাখে।

তৃতীয়ত, বিয়ের মাধ্যমে **বংশধারা রক্ষা পায়** এবং পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। নবীজী (সা.) কিয়ামতের দিন তাঁর উম্মতের আধিক্য নিয়ে গর্ব করবেন, আর বিয়ে ছাড়া এটি সম্ভব নয়। চতুর্থত, বিয়ে মানুষের **রিজিক বা ভাগ্যে বরকত** আনে। আল্লাহ তায়ালা অভাবগ্রস্তদের বিয়ের পরামর্শ দিয়ে বলেছেন যে, তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদের স্বচ্ছল করে দেবেন। পঞ্চমত, বিয়ে একজন মানুষের **ঈমানকে পূর্ণতা দান করে**। হাদীস অনুযায়ী, বিয়ের মাধ্যমে মানুষের অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ হয়। এছাড়া এটি একটি বড় সামাজিক বন্ধন যা দুটি পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তার সেতুবন্ধন তৈরি করে। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী, বিয়ে কেবল ব্যক্তি নয়, বরং একটি আদর্শ সমাজ ও জাতি গঠনের মূল চাবিকাঠি। এটি মানুষকে দায়িত্বশীল ও সংযমী হতে সাহায্য করে।

(ঈ) বিয়েতে লিপ্ত হওয়া বনাম নির্জনে ইবাদত— কোনটি উত্তম? (الاشتغال بالنكاح أفضل أم التخلى في العبادات ؟ بين .)

এই বিষয়টি নিয়ে ফকীহদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। হানাফী মাযহাবের ইমামদের মতে, সাধারণভাবে নির্জনে নফল ইবাদতে মগ্ন থাকার চেয়ে বিয়ে করা এবং সাংসারিক দায়িত্ব পালন করা অনেক বেশি উত্তম ও সওয়াবের কাজ। এর প্রধান কারণ হলো, বিয়ে করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি কেবল নিজের নয়, বরং তার স্ত্রীর ও সন্তানদের দ্বীনদারি রক্ষা করে এবং তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে। নবীজী (সা.) বলেছেন, "বিয়ে আমার সুন্নাত, যে আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার দলভুক্ত নয়।"

হানাফী ফিকহ অনুযায়ী, বিয়ে কেবল একটি জৈবিক প্রয়োজন নয়, বরং এটি একটি সামাজিক ইবাদত যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। নির্জন ইবাদত বা 'তাকহাল্লী' কেবল ব্যক্তিগত ফায়দা দেয়, কিন্তু বিয়ে একটি সুস্থ প্রজন্ম গড়ে তুলতে সাহায্য করে যা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করে। যদি কারো নফল ইবাদতের কারণে পারিবারিক দায়িত্বে অবহেলা হয়, তবে সেই ইবাদতের চেয়ে দায়িত্ব পালনই অগ্রগণ্য। তবে যদি কোনো ব্যক্তি নিশ্চিত হয় যে সে বিয়ের কারণে আল্লাহর ফরজ বিধানগুলো ভুলে যাবে বা চরম জুলুম করবে, তবে তার জন্য নির্জনে ইবাদত করা সাময়িকভাবে শ্রেয় হতে

পারে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায়, ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা অনুযায়ী বিয়ে করাই হলো সর্বোত্তম পন্থা, কারণ এটি নবীগণের আদর্শ এবং দ্বীনের হেফাজতের মাধ্যম।

(উ) বর্তমানে বিয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত কুসংস্কার ও অপ্রয়োজনীয় প্রথা (ما هي الخرافات والرسومات المروجة في النكاح في العصر الراهن ؟ بين .)

বর্তমান যুগে মুসলিম সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে অনেক বিজাতীয় কুসংস্কার ও শরীয়ত পরিপন্থী প্রথা জেঁকে বসেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় অভিশাপ হলো **যৌতুক প্রথা**। পাত্রপক্ষের পক্ষ থেকে কনেপক্ষের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করা বা উপহারের নামে সম্পদ দাবি করা সম্পূর্ণ হারাম। দ্বিতীয়ত, **বিলাসবহুল আয়োজন ও অপচয়**। বিয়ের অনুষ্ঠানে অঢেল টাকা খরচ করে আলোকসজ্জা, স্টেজ ডেকোরেশন এবং লোকদেখানো ভোজের আয়োজন করা হয়, যা সুন্নাহর পরিপন্থী। নবীজী (সা.) বলেছেন, "সেই বিয়ে সবচেয়ে বরকতময় যা সবচেয়ে সহজ ও কম খরচে সম্পন্ন হয়।"

তৃতীয়ত, **নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা**। গায়ে হলুদ বা বিয়ের অনুষ্ঠানে পর্দা লঙ্ঘন করে নাচ-গান ও ভিডিও করার প্রথা বর্তমান সময়ে চরম আকার ধারণ করেছে। এগুলো ইবাদতের পরিবেশকে পাপাচারের আখড়ায় পরিণত করে। চতুর্থত, বিয়ের সময় বিভিন্ন **হিন্দুয়ানি বা বিজাতীয় রসম** যেমন কপালে টিপ দেওয়া, কুলার ব্যবহার বা নির্দিষ্ট কোনো অশুভ সময়ের ভয় পাওয়া—এসবই কুসংস্কার। এছাড়াও মোহরানা পরিশোধ না করে কেবল কাগজে লিখে রাখা বা মোহরানা নিয়ে টালবাহানা করা একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। হানাফী ফিকহের মানদণ্ড অনুযায়ী, বিয়ে হওয়া উচিত অত্যন্ত সাদামাটা, সুন্নাহ মোতাবেক এবং অপচয়মুক্ত। বর্তমানের এই সব কুপ্রথা সামাজিক অবক্ষয় ও ঋণগ্রস্ততার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা থেকে উম্মাহর ফিরে আসা জরুরি।

প্রশ্ন-৮: ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর জীবনী ও মুহাদ্দিসগণের মাঝে তাঁর মর্যাদা (ترجمة الإمام مسلم رحمه الله مع بيان مكانته بين المحدثين)

জন্ম ও বংশ পরিচয়: হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাসের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র ইমাম মুসলিম (রহ.) ২০৪ হিজরী (মতান্তরে ২০৬ হিজরী) সালে ইরানের খোরাসান অঞ্চলের নিশাপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো নাম মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুশায়রী আন-নিশাপুরী। তিনি আরবের বিখ্যাত 'কুশায়র' গোত্রের লোক ছিলেন, যা ঐতিহাসিকভাবেই অত্যন্ত সম্মানিত ছিল। শৈশব থেকেই তিনি অত্যন্ত মেধাবী ও দ্বীনদার প্রকৃতির ছিলেন এবং এক স্বচ্ছ ও পবিত্র জ্ঞানচর্চার পরিবেশে বড় হন।

শিক্ষা সফর ও উস্তাদবৃন্দ: ইমাম মুসলিম (রহ.) মাত্র ১২ বছর বয়স থেকেই হাদীস সংগ্রহ ও চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের সান্নিধ্য লাভের জন্য তিনি তৎকালীন মুসলিম জাহানের প্রধান প্রধান শিক্ষা কেন্দ্রগুলো যেমন—মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা, বাগদাদ, সিরিয়া এবং মিশর সফর করেন। তাঁর উস্তাদদের তালিকা অনেক দীর্ঘ, যার মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ, ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন এবং কুতাইবা ইবনে সাঈদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে তাঁর জীবনের মোড় পরিবর্তনকারী উস্তাদ ছিলেন ইমাম বুখারী (রহ.)। ইমাম বুখারীর নিশাপুরে আগমনের পর ইমাম মুসলিম তাঁর একনিষ্ঠ ছাত্রে পরিণত হন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাঁর ছায়াতলে থেকে হাদীসের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলো আয়ত্ত করেন।

সহীহ মুসলিম সংকলন: ইমাম মুসলিমের অমর কীর্তি হলো 'সহীহ মুসলিম'। এটি সংকলন করতে তাঁর প্রায় ১৫ বছর সময় লেগেছিল। তিনি তাঁর স্মৃতিতে থাকা প্রায় ৩ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাই-বাছাই করে অতি নিখুঁত ও বিশুদ্ধ হাদীসগুলোই এই কিতাবে স্থান দিয়েছেন। তিনি এই কিতাবটি রচনার ক্ষেত্রে কেবল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের (রাবী) ওপর নির্ভর করেননি, বরং সনদের ধারাবাহিকতা ও শব্দের নির্ভুলতার ওপরও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর এই সংকলনটি বর্তমানে সারা বিশ্বের মুসলিমদের কাছে কুরআনের পর সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাবসমূহের মধ্যে দ্বিতীয় হিসেবে স্বীকৃত।

মুহাদ্দিসগণের মাঝে তাঁর মর্যাদা: মুহাদ্দিসগণের নিকট ইমাম মুসলিমের মর্যাদা অনন্য। তিনি কেবল একজন সংকলকই ছিলেন না, বরং হাদীসের ত্রুটি ও বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্যতা যাচাইয়ে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছিলেন। হাদীসের বিন্যাসে তাঁর দক্ষতা দেখে তাঁর উস্তাদ ইমাম বুখারীও তাঁকে উচ্চাসনে

বসাতেন। হাফেজ আবু আলী নিশাপুরী বলেছেন, "আসমানের নিচে ইমাম মুসলিমের কিতাবের চেয়ে বেশি বিশুদ্ধ আর কোনো কিতাব নেই।" তাঁর বিন্যাস শৈলী এতই উন্নত ছিল যে, তিনি একটি হাদীসের সব কটি সূত্র একই স্থানে উল্লেখ করতেন, যা অন্য কোনো সংকলনে দেখা যায় না।

মৃত্যু: এই মহান মনীষী হিজরী ২৬১ সালে ৫৩ বা ৫৫ বছর বয়সে নিশাপুরেই ইন্তেকাল করেন। কথিত আছে, ইলমী আলোচনায় নিমগ্ন থাকা অবস্থায় একটি হাদীস খুঁজতে খুঁজতে তিনি অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। (তথ্যসূত্র: উত্তরটি সাধারণ নির্ভরযোগ্য ইসলামী ইতিহাস থেকে সংগৃহীত, যা আপনার প্রদত্ত উৎসগুলোতে কেবল প্রশ্ন আকারে রয়েছে)।

প্রশ্ন-৯: সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম-এর তুলনামূলক আলোচনা (وازن بين الصحيح المسلم والصحيح للبخاري)

ভূমিকা: ইসলামী বিশ্বে 'সহীহাইন' বা দুই সহীহ বলতে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের সংকলন দুটিকে বোঝানো হয়। এ দুটি কিতাবই হাদীসের বিশুদ্ধতার বিচারে সর্বোচ্চ মানের। তবে মুহাদ্দিসগণ এই দুটি কিতাবের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে দীর্ঘ তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সামগ্রিকভাবে সহীহ বুখারীকে প্রথম এবং সহীহ মুসলিমকে দ্বিতীয় ধরা হলেও কিছু নির্দিষ্ট গুণের কারণে সহীহ মুসলিমও অনন্য মর্যাদার অধিকারী।

বিশুদ্ধতা ও শর্তের কঠোরতা: সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো বর্ণনাকারীদের সরাসরি সাক্ষাতের শর্ত নিয়ে। ইমাম বুখারী (রহ.) কোনো হাদীসকে সহীহ বলতে হলে শর্ত করেছেন যে, বর্ণনাকারী এবং তাঁর উস্তাদের মধ্যে কেবল সমসাময়িকতা থাকলেই হবে না, বরং তাঁদের মধ্যে সরাসরি সাক্ষাতের (লিক্বা) প্রমাণ থাকতে হবে। অন্যদিকে ইমাম মুসলিম (রহ.) কেবল সমসাময়িক হওয়া এবং সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। একারণে ইমাম বুখারীর মানদণ্ডকে অধিকতর শক্তিশালী ও নিরাপদ মনে করা হয়। এই কঠোরতার কারণেই সহীহ বুখারী উম্মাহর নিকট সর্বাধিক বিশুদ্ধ কিতাব হিসেবে স্বীকৃত।

ফিকহী বিন্যাস ও শিরোনাম: ইমাম বুখারী তাঁর কিতাবে ফিকহী মাসআলার ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। তিনি প্রতিটি অধ্যায়ের এমন কিছু শিরোনাম (তাজরীমুল আবওয়াব) নির্ধারণ করেছেন, যা থেকে ইসলামের অনেক সূক্ষ্ম ফিকহী সমাধান

পাওয়া যায়। অনেক সময় তিনি একটি দীর্ঘ হাদীসকে বিভিন্ন অধ্যায়ে টুকরো টুকরো করে বর্ণনা করেছেন মাসআলা প্রমাণের জন্য। অন্যদিকে ইমাম মুসলিমের বিশেষত্ব হলো, তিনি ফিকহী বিন্যাসের চেয়ে হাদীসের মূল পাঠ ও সূত্রগুলোকে অবিকৃতভাবে একই স্থানে রাখার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে অধ্যায়ের শিরোনাম দেননি (পরবর্তীতে ইমাম নববী ও অন্যান্যরা শিরোনাম দিয়েছেন), যার ফলে পাঠক একই জায়গায় একটি হাদীসের সব কটি সংস্করণ পেয়ে যান।

উপস্থাপনা শৈলী ও সহজলভ্যতা: ব্যবহারিক দিক থেকে সহীহ মুসলিম পাঠকদের জন্য অধিক সুবিধাজনক। ইমাম মুসলিম (রহ.) একটি হাদীস বর্ণনা করার সময় তার সব কটি সনদ বা সূত্র এক জায়গায় সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন। এতে হাদীসটি বুঝতে ও তার বিভিন্ন বর্ণনার পার্থক্য ধরতে অত্যন্ত সহজ হয়। অন্যদিকে ইমাম বুখারী একই হাদীস কিতাবের দশটি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন, যা সাধারণ গবেষকদের জন্য খুঁজে পাওয়া কঠিন হতে পারে। একারণেই মাগরেব বা পশ্চিমের অনেক মুহাদ্দিস বিন্যাসের কারণে সহীহ মুসলিমকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

ভূমিকা বা মুকাদ্দিমা: ইমাম মুসলিম তাঁর কিতাবের শুরুতে একটি দীর্ঘ ও অত্যন্ত তথ্যবহুল ভূমিকা (মুকাদ্দিমা) লিখেছেন, যা ইলমে হাদীসের মূলনীতি, বর্ণনাকারীদের প্রকারভেদ এবং হাদীস গ্রহণের শর্তাবলি বুঝতে অত্যন্ত জরুরি। সহীহ বুখারীর শুরুতে এমন কোনো দীর্ঘ শাস্ত্রীয় ভূমিকা নেই। ইমাম মুসলিমের এই মুকাদ্দিমাটি হাদীস গবেষণার একটি মৌলিক দলিলে পরিণত হয়েছে।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায়, সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম—এই দুই মহাসমুদ্রের মধ্যে কোনটি বড় তা নির্ণয় করা কঠিন। সহীহ বুখারী যদি হয় জ্ঞানের সর্বোচ্চ চূড়া, তবে সহীহ মুসলিম হলো সেই জ্ঞানের সুশৃঙ্খল ও নান্দনিক বিন্যাস। উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য এই দুটি কিতাবই অপরিহার্য। মূলত ইমাম মুসলিম তাঁর উস্তাদ ইমাম বুখারীর কাজেরই একটি সুশৃঙ্খল পূর্ণতা দান করেছেন। (তথ্যসূত্র: উত্তরটি মুহাদ্দিসগণের শাস্ত্রীয় বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা আপনার উৎসে কেবল প্রশ্ন হিসেবে নির্দেশিত)।